بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) আজ ১৬ই জুলাই, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের ধারা জারি রাখেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তাঁর খিলাফতকাল নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল। সেই যুগে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও বিজয় অর্জিত হয় সে সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকাল ১৩ হিজরী হতে ২৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দশ বছর ব্যাপৃত ছিল। এই যুগে সংঘটিত বিজয়সমূহের ব্যাপকতার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা শিবলী নো'মানী তার পুস্তকে লিখেন, হযরত উমর (রা.)'র বিজিত অঞ্চলসমূহের মোট আয়তন ছিল ২২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০ বর্গমাইল; এরমধ্যে সিরিয়া, মিসর, ইরান ও ইরাক, খুযিস্তান, আর্মেনিয়া, আযারবাইজান, পারস্য, কিরমান, খোরাসান ও মাকরান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হুযূর (আই.) বলেন, মুসলিম বাহিনীর জয়যাত্রা তো হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগ থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল; তাঁর খিলাফতকালে সিরিয়া ও ইরাকে মুসলিম বাহিনী জিহাদরত ছিল এবং একই সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনেও জিহাদ চলমান ছিল। এই ধারা হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালেও অব্যাহত থাকে। হযরত উমর (রা.)'র যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রায় সবগুলো বিজয়ের সময়ই মুসলিম বাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর খিলাফতকালে কোন যুদ্ধেই নিয়মিতভাবে অংশ নেন নি, কিন্তু মুসলিম সেনাপতিদের যাবতীয় নির্দেশনা তিনি মদীনা থেকে প্রেরণ করতেন। কোন কোন যুদ্ধের ঘটনাবলী থেকে জানা যায়, মুসলিম সেনাপতিদের সাথে হযরত উমর (রা.)'র প্রতিদিনই চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো; আর তাঁর চিঠিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী দেখে মনে হতো, মদীনাতে বসেও তিনি সেই অঞ্চলের সবকিছু চাক্ষুস দেখছেন বা সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তাঁর চোখের সামনে রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, **'আমি নামাযের মাঝেও আমার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করি।'** অর্থাৎ নামাযের ভেতরেও তিনি মুসলিম বাহিনীর রণকৌশল নিয়ে চিন্তা করতেন এবং তাদের জন্য দোয়াও করতেন। বস্তুতঃ এ কারণেই চরম কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা মুসলিম বাহিনীকে জয়ী হতে দেখি।

হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে পারস্যবাসীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং খলীফার পক্ষ থেকে সংবাদ মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন হযরত মুসান্না (রা.) একজনকে নিজের স্থলে নেতৃত্ব সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে স্বয়ং মদীনায় আসেন খলীফাকে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করতে এবং সাহায্যের জন্য আরও সৈন্য প্রেরণের বিষয়ে অনুরোধ জানাতে। হযরত আবু বকর (রা.) তখন হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে বলেন, তিনি সেদিনই কিংবা সেদিন রাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারেন; যদি তিনি দিনেই মৃত্যুবরণ করেন তবে যেন হযরত উমর (রা.) সন্ধ্যার পূর্বেই মানুষকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে হযরত মুসান্নার সাথে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন, আর যদি রাতে তাঁর মৃত্যু হয় তবে যেন সকাল হওয়ার পূর্বেই এমনটি করেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু-পরবর্তী কঠিন পরিস্থিতিতেও জিহাদের জন্য মুসলিম বাহিনীকে প্রেরণের ক্ষেত্রে নিজের অবিচলতা এবং তার উত্তম ফলাফলের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.)ও

এরূপই করেন; হযরত আবু বকর (রা.)'র দাফনকার্য সমাধা হওয়ার পরদিনই যখন সব স্থান থেকে মুসলমানরা নতুন খলীফার হাতে বয়আত করার জন্য উপস্থিত হন তখন তিনি সেই সুযোগে তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আরবরা যেহেতু সুদীর্ঘ কাল থেকে পারস্য সাম্রাজ্যের শৌর্য-বীর্য ও সামরিক শক্তিকে ভয় পেতো, তাই এই আহ্বানে তেমন সাড়া পড়ে নি। হযরত উমর (রা.) তিনদিন পর্যন্ত উপদেশ দিতে থাকেন, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। অবশেষে তিনি (রা.) এতো জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন যে, সবাই উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। হযরত আবু উবায়দ বিন মাসঊদ সাকফী সর্বপ্রথম উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন যে, তিনি যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত, তার সাথে সাথে সা'দ বিন রবী' ও সালিত বিন কায়েসও এগিয়ে আসেন। এই তিনজন এগিয়ে আসার সাথে সাথে অন্যরাও, যাদের মাঝে ঈমানের স্পৃহা ও আবেগের ঝড় বইছিল, তারাও একযোগে জিহাদে যাওয়ার ঘোষণা করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মদীনা থেকে এক হাজার সৈন্য ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন, তবে বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে এই সংখ্যা পাঁচ হাজারে উন্নীত হয়। হযরত উমর (রা.) এই নতুন বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন হযরত আবু উবায়দকে, যিনি মুহাজির বা আনসার ছিলেন না। ইসলামের প্রথম যুগের সেবক মুহাজির ও আনসারদের বাদ দিয়ে তাকে দায়িত্ব দেয়ায় কেউ কেউ অনুযোগ করেছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.) সবাইকে বলে দেন, মুহাজির ও আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইসলামের সেবায় তাদের অগ্রগামীতার কারণে; যেহেতু আজ তারা এই আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করেছে এবং আবু উবায়দ প্রথমে এগিয়ে এসেছে, তাই তার হাতেই এই নেতৃত্বভার অর্পণ করা হয়েছে আর মুহাজির-আনসাররা তাদের প্রাধান্য হারিয়েছে। তবে একইসাথে তিনি (রা.) আবু উবায়দকেও সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রণক্ষেত্রে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে দেন।

ত্রয়োদশ হিজরীতে নামারিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু উবায়দের বাহিনী যাত্রা করার পূর্বেই হযরত মুসান্না (রা.) ফিরে গিয়ে নিজ বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেয়ায় তাকে বেশ কিছুটা পিছু হটতে হয়। ইতোপূর্বে পারস্য সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় ছিল, কিন্তু রুস্তম নামক নতুন একজন বীর সম্রাটের অধীনে সমগ্র পারস্য ঐক্যবদ্ধ হয়। রুস্তম ইতোমধ্যে মুসলমানদের বিজিত অঞ্চলগুলোতে লোক পাঠিয়ে বিদ্রোহ করার উস্কানি দেয়, যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত মুসান্না (রা.)-কে বেশ কিছুটা পিছু হটতে হয়। রুস্তম শক্তিশালী সব সৈন্যদল বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের জন্য পাঠাতে থাকে। **নামারিক**-এ আসা পারস্য বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল **জাবান** আর **কাসকার**-এ আগত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল **নার্সি** নামক আরেক সেনাপতি। বিপরীত দিকে আবু উবায়দের বাহিনীও পৌঁছে যায়। নামারিকের যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয় এবং জাবান মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, কিন্তু যেহেতু তার পরিচয় অজানা ছিল তাই সে সাধারণ সৈন্যের মতই মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সে পুনরায় যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হলে হযরত আবু উবায়দের কাছে তাকে আনা হয় এবং তার প্রকৃত পরিচয় জানানো হয়। কিন্তু তবুও তিনি এই উদারতা প্রদর্শন করেন যে, ইতোপূর্বে যেহেতু তাকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাই এবার তাকে বন্দী করে রাখা সমীচীন হবে না। অতঃপর তাকে পুনরায় মুক্তি দেয়া হয়। **নামারিকে** জয়ী হওয়ার পর আবু উবায়দ তার বাহিনী নিয়ে **কাসকার**-এ অবস্থিত অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেন। এর ধারাবাহিকতায় সাকাতিয়ার যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধেও মুসলমানগণ জয়ী হন। ১৩ হিজরীতে **বারুসিমার** যুদ্ধও সংঘটিত যাতে পারস্য বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় প্রখ্যাত সেনাপতি জালিনুস, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর হাতে সে করুণ পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে; কতিপয় বর্ণনায় তার সন্ধি করারও উল্লেখ

রয়েছে। ১৩ হিজরীতে ঐতিহাসিক জিসর বা পুলের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। হুযূর (আই.) ইতোপূর্বেও এই যুদ্ধের ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা করেছেন, আজও পুনরায় বর্ণনা করেন। এই যুদ্ধের এরূপ নামকরণের কারণ হল ফোরাত নদীর দুই তীরে মুসলিম ও পারস্য বাহিনী সমবেত হলে যুদ্ধ সংঘটনের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে একটি পুল নির্মাণ করা হয়। মুসলমানদের দশ হাজার সেনার বিপরীতে পারস্য বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য ও তিনশ' হাতি ছিল। পারস্য সেনাপতি বামান জাযভিয়ার আমন্ত্রণে হযরত আবু উবায়েদ মুসলিম বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে যুদ্ধ করতে যান। প্রথমদিকে পারস্য বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়লেও তারা যখন হাতিগুলোকে এগিয়ে দেয় তখন মুসলমান বাহিনীর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে। হযরত আবু উবায়েদ হাতিগুলোকে আক্রমণ করতে বলেন এবং সেগুলোর শুঁড় কেটে দিতে বলেন। এভাবে পুনরায় মুসলমানরা যুদ্ধে ফিরে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ আবু উবায়েদ হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে শহীদ হন। ইতোপূর্বে তার স্ত্রী দুমা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যা আবু উবায়দ, তার পুত্র এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়ের যুদ্ধে শাহাদতের প্রতি ইঙ্গিত করছিল। আবু উবায়দ নিজের শাহাদতের পর একে একে তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের কথা বলে গিয়েছিলেন, অষ্টম নেতা হিসেবে তিনি হযরত মুসান্না (রা.)'র নাম বলে যান। বস্তুতঃ হুবহু তা-ই ঘটে। এই যুদ্ধে চার হাজার মুসলিম শহীদ হন এবং ছয় হাজার ইরানী নিহত হয়। হযরত উমর (রা.) যখন এই সংবাদ পান তখন তিনি মদীনার মুসলমানদের একত্র করে বলেন, এখন মদীনা ও ইরানের মধ্যে আর কোন বাধা নেই এবং মদীনা সম্পূর্ণ অরক্ষিত; তাই তিনি স্বয়ং বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলায় যেতে চান। কিন্তু হযরত আলী (রা.)'র সুচিন্তিত পরামর্শে ইসলামের স্বার্থে তিনি এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং সিরিয়ায় জিহাদরত হযরত সা'দকে নিজ বাহিনী নিয়ে ইরানী বাহিনীর মোকাবিলায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। হুযূর (আই.) বলেন, এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার দ্বিতীয়াংশে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন, মিসরের ফাতহী আব্দুস সালাম মুবারক সাহেব, যিনি সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতা নকশবন্দী তরিকার অনুসারী ছিলেন এবং নিজের এই পুত্রকে ধর্মসেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ফাতহী সাহেব দশ বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন, পরবর্তীতে আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলী হন। হুযূর তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমানবর্ধক ঘটনাও তুলে ধরেন; তার দোয়ার বরকতে তার পিতাও ৮৮ বছর বয়সে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি জীবনের শেষ কয়েক বছর জীবনোৎসর্গকারী হিসেবেও জামাতের সেবা করেছেন, এছাড়া সারা জীবনই তিনি বিভিন্নভাবে জামাতের সেবায় নিবেদিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং সবসময় প্রচুর অধ্যয়ন করতেন, যার মাঝে বিরাট একটি অংশ ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী। একজন মুরব্বী লিখেছেন, বারাহীনে আহমদীয়া যে তিনি কতবার পড়েছেন তা আমাদের জানা নেই। হুযূর (আই.) স্বয়ং তার মাঝে খিলাফতের জন্য অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখতে পেয়েছেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি পরম বিনয়ী ছিলেন বলে মন্তব্য করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ইসলামে কোন কাজই খিলাফত ছাড়া সঠিকভাবে হওয়া সম্ভব না। প্রয়াত ফাতহী সাহেব এমটিএ আল্ আরাবিয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন, বিশেষকরে আল্ হেওয়ারুল মোবাশের এর তিনি নিয়মিত প্যানেলিষ্ট ছিলেন। মরহুমের নাতিদীর্ঘ স্মৃতিচারণে হুযূর তার অজস্র গুণাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটি তুলে ধরেন। ২য় স্মৃতিচারণ ছিল কানাডার প্রাক্তন মুবাল্লিগ ইনচার্জ খলীল আহমদ মোবাশ্বের সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা রাজিয়া বেগম সাহেবার, ৩য় ডাঃ সুলতান আহমদ মুবাশ্বের সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা

সায়েরা সুলতান সাহেবার ও ৪র্থ স্মৃতিচারণ সিরিয়ার মোকাররমা গুসুন আল্ মাযাওয়ানি সাহেবার, যিনি ২০১৫ সালে হিজরত করে তুরস্কে চলে এসেছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]